OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 242 - 248
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 242 - 248
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

স্মৃতি-সত্তা-শৈশব : তারাপদ রায়ের কলমে স্মৃতিচারণার এক বর্ণময় যাত্রা

সংহতি সাহা
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: SANHATISAHA96@GMAIL.COM
0009-0007-7516-0358

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Tarapada Roy, SmritiKatha, Childhood memories across Bengal border, Charabari Porabari, Bangladesher Hridoy Hote, Kothay Jacchen Tarapadababu, Dhaleshwari Nodi Tire.

Abstract
Tarapada Roy is renowned for his humorous and light-hearted essays. Apart from that, he contributed greatly to various forms of literature, such as poetry, memoir, children's literature, novel, etc, which remained relatively less noticed by Bengali readers. Throughout his literary career he remained versatile and left his mark in different genres. In this essay, we will explore these lesser- known aspect of him. For that purpose, we have selected four of his writings- 'KOTHAY JACCHEN TARAPADABABU?', 'CARABARI PORABARI', 'BANGLADESHER HRIDOY HOTE', 'DHOLESHWARI NODI TIRE', in which he depicts his childhood memories of undivided Bengal through his writings. These writings take us on an emotional journey into the past. Tarapada Roy had a unique way of observing things, and his method of memoirs was equally distinctive. He observed the past from the viewpoint of his child-self. Very little, seemimgly insignificant events found their way in to his writings. However, though his excellent presentation, these events left a permanent impression on the reader's mind. He was a 'Bangal' by birth, And his connection with East Bengal is reflected in his writings. Through these works, readers can experience the essence of a calm, peaceful rural life. The main purpose of this essay is to rediscover this different aspect of Tarapada Roy as a memoirist.

Discussion

তারাপদ রায় (১৯৩৬-২০০৭) নামের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের মুচকি হাসির স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। কখনো ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায় ছুরি শানিয়ে কখনো অনাবিল কৌতুকে কলম ডুবিয়ে তিনি শাসন করেছেন বাঙালী পাঠক মহল। আপাত তুচ্ছ বিষয়কে দক্ষতার সঙ্গে গভীর ভাবে উপস্থাপন করাই তাঁর নিজেস্ব স্টাইল। বাংলার রম্য-রচনার আকাশে তারাপদ রায়কে নক্ষত্রপ্রতিম বললেও ভুল হবে না। দুঃখের বিষয় রম্যরচনাকার এই পরিচয়ের আড়ালে সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত হয়েছে তাঁর কবি পরিচয়টি, অথচ তাঁর বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ কবি হিসেবেই। রয়েছে পনেরোটির বেশি কাব্যগ্রন্থ। যুক্ত ছিলেন বিখ্যাত

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 242 - 248
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কবিতা পত্রিকা 'কৃত্তিবাস'-র সঙ্গে। এখানেই তারাপদ রায়ের কলম থেমে থাকেনি। লিখেছেন আরও অনেককিছু। অনুপম মুখোপাধ্যায় যখন লেখেন –

> "...তারাপদ রায়ের শানিত কলম বহুমুখী রচনায় সমৃদ্ধ। তিনি ভ্রমণ কাহিনি, স্মৃতিকথা, উপন্যাস, নাটক, শিশুসাহিত্য - সবরকম দিকেই পারদর্শী হয়ে পাঠকমনে জনপ্রিয় হয়েছেন।"[১]

তখন অত্যুক্তি মনে হয় না। সাহিত্যিক হিসেবে তারাপদ রায়ের বহুমুখিতা সত্যিই আমাদের বিস্মিত করে। এই একই কথা বলতে চেয়েছেন সস্বিত বসু, লিখছেন, -

> "চারপাশে রম্যের দেওয়াল তুলে ভেতরে বাঁচছিলেন তিনি, অন্য এক তারাপদ হয়ে।"[২]

এই 'অন্য তারাপদ'-এর খোঁজ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। যার জন্য আশ্রয় নেবো তাঁর স্মৃতিআশ্রিত কয়েকটি লেখার। বলা বাহুল্য তারাপদ রায়ের এই নির্বাচিত স্মৃতিআশ্রিত লেখাগুলিই এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য।

শুরুতেই বলে রাখি তারাপদ রায় ১৯৩৬ সালে অবিভক্ত বাংলার টাঙ্গাইলের এলাসিন গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ওখানেই কাটিয়েছেন শৈশবকাল। ১৯৫১ সালে কলকাতায় চলে আসেন এবং এখানেই স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। তখন তিনি সদ্য কৈশোরে পা দিয়েছেন। আসলে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ রাতারাতি বদলে দিয়েছিল অনেক সমীকরণ। কাঁটা তারের এপার ওপারে তখন দুটো আলাদা দেশ, দুটো আলাদা বাংলা। বোঝাই যাচ্ছে তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে রয়েছে ওপার বাংলার স্মৃতি, যা নানা সময়ে তাঁর লেখার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। এই রকম একই টাইম-ফ্রেমে লেখা ওপার বাংলার স্মৃতি বিজড়িত তাঁর চারটি লেখা এই প্রবন্ধের আলোচিত হবে। তার মধ্যে পরে – 'কোথায় যাচ্ছেন তারাপদবাবু?' (১৯৭০), 'চারাবাড়ি পোড়াবাড়ি' (১৯৯০), 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে' (১৯৯৭), 'ধলেশ্বরী নদী তীরে' (১৯৯৯)।

তার মধ্যে প্রথম তিনটি স্মৃতিকথা। শেষটি একটি উপন্যাস, শৈশব স্মৃতি যেখানে ছায়া ফেলেছে। যে কারণে প্রকরণগত দিক দিয়ে আলাদা হলেও 'ধলেশ্বরী নদী তীরে' প্রকৃতিগত দিক থেকে সমগোত্রীয়। তাই হয়তো এগুলির একত্র আলোচনা অসমীচীন হবে না।

সামগ্রিক আলোচনায় যাওয়ার আগে আলাদা ভাবে এই চারটি লেখা সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নেওয়া যাক -

চারাবাড়ি পোড়াবাড়ি : এটি মূলত পারিবারিক স্মৃতির কিছু কিছু অংশ, যা বিষয়গত দিক থেকে হয়তো অন্যান্য লেখাগুলির মধ্যেও পৌনঃপুনিক ভাবে ফিরে ফিরে এসেছে। বৃহৎ যৌথ পরিবার। পারিবারিক ভাবে ওকালতির পেশায় যুক্ত বাপ-ঠাকুরদা এলাসিনের নিজেস্ব দেশের বাড়ি ছেড়ে কর্মসূত্রে থাকেন টাঙ্গাইলে। সঙ্গে থাকে পরিবারটিও। তাই লেখাটির স্থানগত বিস্তার এই সীমানার মধ্যেই ঘোড়া ফেরা করেছে। বাড়তি আকর্ষণ সোনাকাকা ও মান্ধাই জ্যাঠার উপাখ্যান। সোনাকাকা ওরফে অমররাম ছিলেন ভালো ছাত্র, কলকাতায় থেকে ওকালতি পড়তেন বাপ-দাদার মতোই। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে জেলে গেছেন কয়কবার। পড়াশোনা ছেড়ে শেষে ফিরে আসেন দেশের বাড়ি। পাগলামির লক্ষণ দেখা দেয়। শেষে অল্প বয়সে সন্ন্যাস রোগে প্রাণ হারান। অন্যদিকে মান্ধাই জ্যাঠা হলেন বাবার এক গৃহত্যাগী কাকা জয়রামের ছেলে। প্রথম জীবনে বেদেদের সংসর্গে বাড়ি ছেড়ে কালক্রমে পৌঁছান আদিবাসী মান্ধাই সম্প্রদায়ের মধ্যে। ওখানেই বিয়ে করে থিতু হন, সন্তান হয়। বহুকাল পর মান্ধাই জ্যাঠা (যা তাঁর প্রকৃত নাম নয়, আদিবাসী সম্প্রদায়ের নাম থেকেই এসেছে এই সম্বোধন) ফিরে আসে পৈত্রিক বাড়িতে। সঙ্গে আনে অপরিচিত আচার আচরণ সংস্কৃতি। এই দুটি উপাখ্যানই বেশ বিস্তারের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে লেখাটিতে। আসলে স্মৃতির পাতায় কোন ঘটনা কতোটা গভীর ভাবে দাগ কেটেছে তা আপাত ভাবে বোঝা না গেলেও বহু বছর পর ধূসর পাতাগুলো ওলটালে ধরা পরে ঘটনার গুরুত্ব। এলোমেলো স্মৃতির ভিড়ে কোন যুগে জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া এই চরিত্রেরা তাই স্মৃতিকথার পাতায় উঠে এসেছে আলাদা করে। তাছাড়া খাপছাড়া উৎকেন্দ্রিক চরিত্রদের প্রতি তারাপদ রায়ের রয়েছে একটু বেশি সহানুভূতি। তাই চত্রিগুলির সঙ্গে গভীর মমত্ববোধ পাঠক মাত্রেই অনুভব করতে পারে। মূলত পারিপাবারিক নানান ঘটনা; সংস্কার; আচার - আচরণ ওপার বাংলার জীবনের ছবিই এই লেখাটির মূল উপজীব্য।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 242 - 248
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাংলাদেশের হৃদয় হতে : তারাপদ রায় মনে করেছিলেন –

> "জীবনের মধ্য বেলায় খর রোদ্দুরে উদরান্নের চিন্তায় শৈশব স্বপ্ন, বাল্য স্মৃতি দূরে সরে যায়। নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।"[৩]

কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটেনি, বরং নিজেই 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে'-র এক জায়গায় লিখেছেন -

> "...স্মৃতির মদিরার নেশা ধরে গেছে আমার। এ গল্পও স্মৃতির দিকেই গড়াচ্ছে, মধ্য জীবনের রুক্ষ টিলা থেকে স্মৃতির সমতলে... কিছুই ভুলিনি। সময় মতো ঠিক মনে পড়ে যায়।"[৪]

তারাপদ রায় স্মৃতির সরণী ধরে পথ হাটতে হাটতে নানান চেনা-অচেনা অলি-গলির সামনে দুদণ্ড থমকে দাঁড়িয়েছেন। 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে' - মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে এমনি নানান বিক্ষিপ্ত স্মৃতি। 'চাড়াবাড়ি পোড়াবাড়ি' - অপেক্ষা এই লেখাটি অনেকাংশেই পারম্পর্যহীন। দৈনন্দিন জীবনের নানান পরিচিত উপাদান যেগুলি এককালে তাঁর শৈশব স্মৃতির অংশ ছিল তা সে হতে পারে দেওয়ালে টাঙ্গানো পুরনো ছবি; উলের তুপি; থলকমল; বট-অশ্বত্থ গাছ আচমকা চোখের সামনে এসে খুলে দিয়েছে মলিন হয়ে যাওয়া স্মৃতির পাতা। এই লেখা আসলে কোন একটি গোটা লেখা নয়, বরং টুকরো টুকরো ছবির কোলাজ। স্মৃতির সুতোয় বাধা হয়েছে তাদের এক মলাটের ভিতরে।

'কোথায় যাচ্ছেন তারাপদবাবু?' : বাকি লেখাগুলির মতো স্মৃতি আশ্রিত রচনা হলেও এই লেখাটি একটু আলাদা স্বাদের। শৈশব-কৈশোর জীবনের উল্লেখ মাত্রই ওপার বাংলার স্মৃতি অবশ্যম্ভাবী ভাবে উঠে এসেছে ঠিকই কিন্তু ফেলে আসা সময়কে দেখার ভঙ্গিমা অনেকটাই বাস্তববাদী। সময়টা যেহেতু বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগের মতো ঘটনার সাক্ষী থেকে গায়ে মেখেছে দগ্ধ স্মৃতির কালি-ঝুলি তখন সে দাগ এড়িয়ে যাওয়া সমীচীন মনে করেননি লেখক। আর এই কারণেই এই লেখাটি আলোচ্য বাকি লেখাগুলির থেকে আলাদা। শৈশব জীবনের সঙ্গে এই লেখায় জায়গা পেয়েছে তারাপদ রায়ের সাহিত্য জীবনের নানান অভিজ্ঞতার স্মৃতিও। পরিণত মন রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রসঙ্গ স্পর্শকাতর ভেবে এড়িয়ে যেতে চাইলেও সম্পূর্ণ নিরস্ত থাকতে পারেননি। চারিপাশ থেকে আসা দাঙ্গা হাঙ্গামার খবর কীভাবে মানুষের ভিতর দেশ ছাড়ার হিড়িক তুলেছিল তা টাঙ্গাইলে থাকা এক কিশোর মনে কীভাবে দাগ কেটেছিল তা ফুটে উঠেছে এই লেখায়। যে কোন অস্থির সময়ে দুটি বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, এক মেনে এগিয়ে চলা নয়তো দুই পরিস্থিতি থেকে যতদূর সম্ভম পালিয়ে বেড়ানো। এই ভিন্ন মতাদর্শের দোটানা খুব সূক্ষ্ম ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। উর্দু শিখে ভিটে মাটির টানে আটকে থাকা মানুষ যেমন এই লেখায় জায়গা পেয়েছে, তেমনি জায়গা পেয়েছে প্রাণ ভয়ে অনিশ্চিতের উদ্দেশে ভেসে পরা মানুষের কথাও। জায়গা পেয়েছে তাঁর বর্তমান জীবনের স্মৃতিও। কলকাতায় চলে আসার পরও শিকড়ের টানে ফিরে ফিরে গেছেন ওদেশে। যা ছিল এককালে তাঁর একান্ত আপন, নিজের জায়গা, তাই রাজনৈতিক কারণে ধীরে ধীরে বদলে যেতে দেখছেন, অপরিচিত হয়ে যেতে দেখছেন। আর এই আক্ষেপ লেখাটির স্তরে স্তরে ছড়িয়ে রয়েছে।

ধলেশ্বরী নদী তীরে : ক্ষুদ্র এই উপন্যাসটির কেন্দ্রে রয়েছে শিবতোষ সান্যাল নামক চরিত্রটি। শিবতোষ একজন সত্তর পার করা অবসরপ্রাপ্ত খবরের কাগজের সাংবাদিক। বর্তমানে সল্টলেকের বাড়ির চৌহদ্দি জুড়ে তাঁর জীবন। কোন বৈবাহিক বন্ধনে আটকা না পরে একলা জীবন কাটিয়েছেন। সঙ্গী বলতে মধ্য বয়সে পৌঁছানো এক অবিবাহিতা অধ্যাপিকা বোনঝি। এদের বর্তমান জীবনের ছবি কিন্তু উপন্যাসটির বিষয়বস্তু হয়েও প্লটের মূল আকর্ষণ শিবতোষের অতীত জীবন। লবনহ্রদের (সল্টলেক) দোতলা বাড়ির বারান্দায় বসে তিনি মাঝে মাঝেই স্বপ্ন দেখেন শৈশব-কৈশোর জীবনের ফেলে আসা দিনের। যে দিনগুলো জুড়ে রয়েছে ধলেশ্বরী নদীর কূলে অবস্থিত গ্রাম্য জীবনের ছবি। যা দেশভাগ পরবর্তীকালে ভিন্ন দেশ। কাঁটাতার মাঝে টেনে দিয়েছে অলঙ্ঘ্য রেখা। আধো ঘুম আধো জাগরণে দেখা স্বপ্ন কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে অনেকটা কল্পনা মিশে বার বার বর্তমান জীবনে হানা দিয়েছে। কাঁটাতার পেড়িয়ে যেতে মনের তো বাঁধা নেই। এই প্রসঙ্গে মনে পরে যায় তারাপদ রায়ের 'দিন আনি দিন খাই' কাব্যগ্রন্থের 'আজীবন, সমস্ত জীবন' কবিতার কয়েকটি পঙক্তি -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 242 - 248
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "কিছু কিছু ভালবাসা আছে,/ যা সারা জীবন সঙ্গে সঙ্গে থাকে।/ কিছু কিছু ভালোবাসা আছে/ যা রক্তের সঙ্গে, চোখের জলের সঙ্গে/ মিশে থাকে/ আজীবন, সমস্ত জীবন।"[৫]

বোঝাই যায় 'আজীবন, সমস্ত জীবন' - ধরে বয়ে চলা ভালোবাসা দেশ-কাল-সময়ের বাধা টপকে লেখক তারাপদ রায়কে আচ্ছন্ন করেছিল, যা শিবতোষের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে।

তবে যেভাবে তিনি শিবতোষকে এঁকেছেন তাতে সাংবাদিকের বাস্তববাদী সত্তা ততোটা প্রখর নয়, বরং কবিসুলভ আবেগপ্রবণতাই চরিত্রে বেশি দেখা গিয়েছে। চরিত্রটিকে বেশিরভাগ সময় দুটি কাজ বার বার করতে দেখা গিয়েছে। এক খবরের কাগজ পড়া, দুই স্বপ্নে পুরনো দিনের স্মৃতি ঘিরে জানা-অজানার জাল বোনা। খেয়াল করার মতো বিষয় হল প্রথমটি তাঁকে বর্তমান সময়ের সঙ্গে জুড়ে রাখে, দ্বিতীয়টি পুরনো সময়কে মনের ভিতর বাঁচিয়ে রাখে। অতীত ও বর্তমানের এই হাত ধরাধরি করে পথ চলা কেবল শিবতোষের নয় উপন্যাসের পুরো বিন্যাসও খানিকটা একই ধারা বজায় রেখে এগিয়েছে। তারাপদ রায় এখানে দুটি আলাদা সময়কালকে পাশাপাশি রাখতে সুন্দর একটি কৌশল ব্যবহার করেছেন। বাস্তবের নানা ঘটনা, পুরনো দিনের মানুষ, শেফালির সৌরভ, বউ-কথা-কও পাখির ডাক চাবির মতো স্মৃতির তালা খুলে ফেলেছে।

বাকি স্মৃতিচারণামূলক লেখাগুলির মতো এখানে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই শিবতোষের স্বপ্নের উৎস হলেও উপন্যাসের খাতিরে এসেছে ভিন্নতা। ঔপন্যাসিক প্রধান চরিত্র শিবতোষ ও তাঁর বোনঝি মহারানী চরিত্র দুটিকে এঁকেছেন বড় নিঃসঙ্গ করে। সদ্য কৈশোরের পা দেওয়া শিবতোষ কুমোরবৌ-এর সঙ্গে পরিচয়ের স্মৃতি ঘিরে মনে মনেই গড়ে তুলেছে রোম্যান্টিক ভুবন। অন্যদিকে মহারানীর শিশু অবস্থা থেকে মা-বাবা বর্জিত জীবন কাটানো, তাদের সম্পর্কের তিক্ততা তাঁর মধ্যে যে একাকীত্ব জন্ম দিয়েছে তাও উপন্যাসটিতে উঠে এসেছে। তবে সব কিছু ছাপিয়েও লেখকের মর্মস্পর্শী ওপারবাংলার বর্ণনা পাঠকের হৃদয়েও মোচড় দিতে সক্ষম হয়েছেন, নস্টালজিক করে তুলেছেন।

উপন্যাস হলেও লেখাটিতে খুব একটা গতানুগতিক নিয়ম মেনে যে লেখা নয় তা বোঝাই যাচ্ছে। উপন্যাস সুলভ বিস্তার লেখাটিতে নেই। অল্প সংখ্যক চরিত্র, ছোটো কাহিনী, সল্প পরিসর সব মিলিয়ে বড় গল্পের সমগোত্রীয় লেখা বললে ভুল হবে না হয়তো। এমনকি কবি মনের আবেগ লেখাটির কথন ভঙ্গিতে মিশে স্বতন্ত্রতা তৈরি করেছে। তারাপদ রায় অবশ্য নিজে সেই কথা স্বীকার করে বলেছেন -

> "... মাঝে মাঝে আমি নিজেই আবিষ্কার করেছি আমি উপন্যাস লিখতে জানি না। উপন্যাস লেখার একটা ঢঙ আছে। কায়দা আছে। আমার উপন্যাস কিরকম পাড়া গাঁয়ের অর্ধ শিক্ষিত লোকের লেখা উপন্যাস মনে হয় - তার স্থায়ী নেই, অন্তরা নেই, আভোগ নেই, সঞ্চারী নেই, এগোয় না পিছোই না।"[৫]

পরিচিত উপন্যাসের ঢঙ নেই বলেই হয়তো পাঠক মনের একঘেয়েমি কেটে গিয়েছে অনায়াসে। এখনেই তারাপদ রায়ের সার্থকতা।

সামগ্রিক ভাবে দেখতে গেলে, এই লেখাগুলি তারাপদ রায়ের নিজেস্ব জীবনের প্রতিচ্ছবি। প্রতিটা লেখার প্রায় সমান্তরাল চলন; বিষয়বস্তুগত মিল এই বক্তব্যের সাক্ষ্য বহন করে। আগেও বলেছি তারাপদ রায় জন্মেছিলেন টাঙ্গাইলের একটি গ্রামে ১৯৩৬ সালে। শৈশব - কৈশোর জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাই এই লেখাগুলির কেন্দ্রীয় উপাদান। লেখাগুলিতে তাই পরিচিত চরিত্রেরা বার বার নানান নামে ফিরে ফিরে এসেছে। তাই 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে'-র আদ্যালক্ষীর সঙ্গে 'চারাবারি পোড়াবাড়ি'-র আজিমা ওরফে রূপবতী দেবীর মিল চিনে নিতে পাঠকের অসুবিধা হয় না। এগুলি আসলে কোন বিচ্ছিন্ন রচনা নয়, একই স্মৃতির বহুমাত্রিক প্রতিফলন। অথচ লেখাগুলিকে কিন্তু আত্মজীবনী বলা চলেন না, কেননা সেখানে কালানুক্রমিক বর্ণনা দেওয়ার দায় থাকে লেখকের। আত্মজীবনীকে হতে হয় আরও বাস্তবের কাছাকাছি। সেখানে লেখক নিজের জীবনকেই তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে সাজালেও স্থান-কাল-পাত্রের যথার্থতা বজায় রেখে চলতে হয় তাঁকে, সত্যনিষ্ঠ হয়ে উঠতে হয়। স্মৃতিকথা বা Memoir সেখানে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়; ঘটনা বা সময়কালকে কেন্দ্র করে নিজের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। জীবনের খণ্ডাংশ বললেও ভুল হবে না। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে 'চারাবারি পোড়াবাড়ি' ও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 242 - 248
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'বাংলাদেশের হৃদয় হতে' ও 'কোথায় যাচ্ছেন তারাপদবাবু?' তিনটি লেখাই স্মৃতিকথা ধর্মী। লেখাগুলিতে কালগত পারম্পর্য রক্ষার চেষ্টা কম, যখন যেমন মনে পরেছে সেভাবেই উঠে এসেছে লেখায়। লেখার খাতিরে কাম্য রূপ নিয়েছে তথ্য। অন্যদিকে 'ধলেশ্বরী নদী তীরে' স্মৃতি আশ্রিত উপন্যাস, যেখানে উপন্যাসের স্বার্থ রক্ষার্থে স্বতন্ত্র চরিত্র ও প্লট লেখা হলেও লেখকের ব্যক্তিগত শৈশব অভিজ্ঞতার স্মৃতি বাকি লেখাগুলির মতোই এখানেও প্রকট ভাবেই রয়েছে। তারাপদ রায় অবশ্য নিজেই বলেছিলেন -

> "ধলেশ্বরী নদী তীরে তো পূর্ববঙ্গের স্মৃতিচিত্র, তার মধ্যে তো কোন মানব চরিত্র আঁকিনি।"[৬]

বরং এঁকেছেন ওপার বাংলার নির্ভেজাল গ্রাম্য জীবনের ছবি। ধলেশ্বরী নদীর বারংবার উল্লেখ পাঠককে মনে করিয়ে দিয়েছে ধলেশ্বরী নদী তীরের জীবন এই উপন্যসের নিয়ামক। যে জীবন কালের স্রোতে হারিয়ে গেছে। একই জায়গায় ফিরে গেলেও আগের মতো করে তাকে ফিরে পাওয়া যাবেনা। নিরাশ হতে হবে বারবার।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো, যে তারাপদ রায়ের রম্যরচনার স্মার্ট বাচনভঙ্গি তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ, সেই একই ব্যক্তি এই লেখাগুলির বেলায় তাঁর হাস্যকৌতুকময় লেখার স্টাইল সেই ভাবে ব্যবহার করেননি। সাদামাটা প্রকাশ ভঙ্গি; জটিলতা বর্জিত ঝরঝরে লেখার প্রতি তাঁর পক্ষপাত অবশ্য বজায় থেকেছে এখানেও। জলের মতো সহজ ভাষা, নিত্যদিনের পরিচিত শব্দ ব্যবহার করেও যে বক্তব্যকে গভীর ও মধুর করে তোলা যায় তারাপদ রায়ের লেখনি তার দৃষ্টান্ত। অধিকাংশ কবিতা বইগুলিতে আমরা যে আটপৌরে তারাপদ রায়কে দেখি তাঁর সঙ্গেই যেন বেশি মিল এই রচনাগুলির লেখকের। তাছাড়া কবি সুলভ আবেগপ্রবণতা লেখনীর বিষয়বস্তুর সঙ্গেও মানিয়ে গেছে অনায়াসেই।

একটি প্রশ্ন অবশ্য একই সঙ্গে মনে ঘুরপাক খায়, যে সাহিত্যমাধ্যম তাঁকে রম্যরচনাকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল সেই পরিচিত মাধ্যমের পাশাপাশি এই স্মৃতিকথাধর্মী লেখাগুলি তিনি কেন লিখতে গেলেন। একটি সাক্ষাৎকারে তারাপদ রায়কে তাঁর অন্যতম জনপ্রিয় শিশু-কিশোর সাহিত্য 'ডোডো তাতাই' সিরিজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন -

> "এগুলো প্রয়োজনের জন্য লিখেছি ... খুব একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, আর্থ-সামাজিক চিন্তা নিয়ে, দেশোদ্ধার করব বলে লিখিনি।"[৭]

বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না এ তাঁর জীবনের স্পর্শকাতর অংশ, অভিমানের জায়গা। সাহিত্যিক হিসেবে টিকে থাকার জন্য ফরমায়েশি লেখা হয়তো তাকেও অনেক লিখতে হয়েছে। যেগুলি তাঁকে জনপ্রিয়তাও দিয়েছে। তবু যে কোন শিল্পীর কাছে যা কিছু তাঁর মনের কাছের শিল্পে তা প্রকাশ করার সুপ্ত বাসনা থাকাটা স্বাভাবিক। 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে'-র ভূমিকা অংশে তিনি স্বীকার করে বলেছেন -

> "এই আমার স্বপ্নের পৃথিবী, স্মৃতির ভুবন। এই পৃথিবীতে আমি আজো মনে মনে বসবাস করি।... 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে' এই রচনামালা, নিতান্ত স্মৃতিচিত্রন নয়, এর সঙ্গে আমার বেদনা ও ভালোবাসা জড়িত।"[৮]

এই একই কথা বোধ হয় তাঁর বাকি সমগোত্রীয় লেখাগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বোঝাই যায় কেবল লিখতে হবে বলে এগুলি লেখা নয়। এই জাতীয় লেখার সঙ্গে রয়েছে তাঁর আত্মিক টান। তাঁর শিল্পী সত্তাকেও তৃপ্তি দিয়েছে এগুলি, পাঠক হিসেবে যা আমাদের মনেও সংক্রামিত হয়েছে। একই সঙ্গে এটাও বোঝা যায় কেন তিনি রম্যরচনার জগতেই তাঁর লেখনীকে সীমাবদ্ধ করেননি, লিখেছেন ভিন্ন স্বাদের এই লেখাগুলি এবং বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের সুযোগ করে দিয়েছেন 'অন্য তারাপদ'-কে চেনার, 'রম্যের দেওয়াল' যাকে আটকাতে পারেনি।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তারাপদ রায়ের রচনা সমগ্রের (১ম খণ্ড) ভূমিকা অংশে লিখেছেন -

> "তারাপদ বাবুর দেখার চোখ ও মন ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। তাই তাঁর আলাদা একটা নিজস্বতা ছিল। তিনি কারোর মতন নন। তিনি তাঁর মতন। আর এই গুনটিই তাঁর খ্যাতির কারণ।"[৯]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 242 - 248
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই মন্তব্যের জের টেনে বলা যায় এই অন্যদের থেকে আলাদা দেখার চোখই তারাপদ রায়ের স্মৃতিকথাগুলিতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। স্মৃতিকথা লিখতে বসে পুরনো সময়কে তিনি দেখেছেন গতানুগতিকতার বাইরে বেড়িয়ে। তাইতো তাঁর স্মৃতিকথাগুলিতে জায়গা করে নিয়েছে জীবনের টুকরো টুকরো নিতান্ত তুচ্ছ ঘটনা, অথচ আপাত ভাবে যা খুব চেনা তাই প্রকাশের মাধুর্যে অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। অথচ লেখাগুলির মধ্যে বর্ণিত সময়কাল গত শতাব্দীর সবচেয়ে ঘটনাবহুল কাল। তিনি চাইলেই তৎকালীন সময়ের কালগত জটিলতা – দেশভাগ – বিশ্বযুদ্ধ - মন্বন্তর ইত্যাদি প্রসঙ্গকে গুরুত্ব দিয়ে বাস্তবতার শক্ত মাটিতে লেখাগুলির ভিত্তি স্থাপন করতে পারতেন, অথচ তিনি জীবনের মাঝ পথে পৌঁছে ওই সময়টাকে তাঁর প্রজ্ঞ পোড় খাওয়া বাস্তব অভিজ্ঞতার চোখে দেখতে চাননি। বরং বেছে নিয়েছেন সেই সময়ে থমকে থাকা শিশু মনটাকে। স্মৃতি রোমন্থনের পালা এলে তাই শৈশবের সরল নিষ্পাপ সত্তাটিকেই তিনি বেছে নিয়েছেন। শিশুমনে যে টুকরো টুকরো ছবি অজান্তেই দাগ কেটেছিল তাই রচনাগুলির বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। ‘কোথায় যাচ্ছেন তারাপদবাবু’ বাদ দিলে বাকি লেখাগুলি অনেকটাই কবি সুলভ পেলবতায় লেখা। নিজেও তিনি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আনতে পছন্দ করতেন না তাঁর লেখায়। সামাজিক-রাজনৈতিক ভণ্ডামির বিরুদ্ধে কলম ধরতে ব্যবহার করতেন ব্যঙ্গ-কৌতুক। তাই বলে কি একেবারেই বাদ দিয়েছেন কালগত পরিচয়? না, তা তিনি করেননি। বৈঠকখানার দেওয়ালে টাঙ্গানো ইংল্যান্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার ছবি; পশমের সুতোয় বোনা ‘ভারতেশ্বরী জগদেশ্বরী’ বুলি; গান্ধী টুপি; ‘করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে’; ‘ইয়ে আজাদি ঝুঠা হ্যায়’; স্বদেশি করার জন্য কারাবাস; দেশ-ভাগ পূর্ববর্তী কালের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি - এমন অনেক টুকরো টুকরো ছবির সাহায্যে লেখক সময়কালকে অদৃশ্য সুতোয় বুনে দিয়েছেন লেখাগুলির প্রেক্ষাপটে। সরাসরি না বলেও উদ্বাস্তু জীবনের অসহায়তার কথা প্রকাশ পেয়েছে এই লেখা গুলিতে, যার মধ্যে রাজনৈতিক বর্ণনার থেকেও বেশি রয়েছে সব ছেড়ে চলে আসার বেদনা, স্মৃতি-কাতরতা।

লেখাগুলিতে আর যে জিনিসটি জালের মতো বিছিয়ে রয়েছে তা হল পূর্ব-বঙ্গীয় আঞ্চলিক রীতি-নীতি, আচার, সংস্কার। পঞ্চবটী বন; শোল মাছের টলটলে কালো চোখ; কালোজিরা চালের গন্ধ; থলকমল; শিবচন্দন; পদ্ম বীজের মোয়া; রাঘবসই মিষ্টি – শব্দগুলি যেন মন্ত্রের মতো কাজ করে। অনায়াসে চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলে করাল গ্রাসে এগিয়ে আসা দুর্দিনের আগের নিস্তরঙ্গ সুন্দর জীবনের ছবি। আসলে তারাপদ রায় ছিলেন আদ্যপান্ত ‘বাঙ্গাল’, এই পূর্ববঙ্গীয় পরিচয় উঁচিয়ে ধরতে সঙ্কোচ বোধ করেননি কখনো। নিজেই এই প্রসঙ্গে অনেক জায়গায় বলেছে -

> “এই তো সেদিনও শক্তি চট্টোপাধ্যায় আমাকে দেখে নাক সিটকিয়ে বলত, ‘গা থেকে এখনও কচুরিপানার গন্ধ বেরোচ্ছে।’ শিবরামীয় অনুশাসন মেনে আমি বলতাম, ‘গা থেকে তো গাঁয়ের গন্ধই বেরোবে।”[১০]

এই ‘গাঁয়ের গন্ধ’-ই তারাপদ রায়ের স্বতন্ত্রতা। মেঠো গন্ধে ভরা স্মৃতিকথাগুলি লেখক তারাপদ রায়ের জাত চিনিয়ে দেয় সহজেই। যদি একটু ভেবে দেখি তাহলে বুঝবো এই স্মৃতি-সংস্কার- আচার- আচরণ সবই তো তাঁকে তাঁর ফেলে আসা জীবনের সঙ্গে জুড়ে রেখেছিল। আসলে যে জীবনের কাছে আর আগের মতো করে ফিরে যাওয়া যাবে না, ব্যবধান শুধু কালগত নয় বরং দেশ ভাগ তৈরি করেছে মাঝে অজস্র অপ্রিয় স্মৃতির প্রাচীর যা পার করে যাওয়া আর সম্ভব নয়। এই অসহায়তা থেকেই জন্ম নিয়েছে আরও তীব্র টান। এগুলিই জায়গা করে নিয়েছে তাঁর লেখায়। এই প্রসঙ্গে সম্বিত বসুর উক্তিটি মনে পরে -

> “...ওঁর লেখায় পাওয়া যাবে ছেঁড়ে আসার বিষণ্ণতা। সেই ছেড়ে আসার বিন্দুটিতে জ্বলজ্বল করছে ঘরবাড়ি, মানুষজন, শান্ত পুকুর, ন্যাজনাড়া পোষ্য - যা যা হারিয়ে একেবারে লোপাট হয়ে গিয়েছে, সেগুলিই। হারানোর এই বোধ, আসলে তীব্র ভাবে জুড়ে থাকারই আর একরকম পিঠ। ... বহু দূর থেকে আঁকড়ে ধরার এই তো একমাত্র নিরুপায় কাটাকুটি, তাঁর স্মৃতিলেখা।”[১১]

তিনি শুধু নিরুপায় বেদনায় স্মৃতিকে আঁকড়িয়েই ধরেননি, স্মৃতির সুতোয় মালাও গেঁথেছেন। জীবনের গভীরতম বিষাদকে প্রকাশ করার এই তাঁর নিজেস্ব ধরন। এই লেখাগুলি পাঠক মনে তৈরি করে অদ্ভুত এক আচ্ছন্নতা যা থমকে দেয় সময়কে। ফেলে আসা জীবনের ধূসর স্মৃতিরা ভিড় করে চোখের সামনে, নিয়ে যায় অন্য এক টাইম ফ্রেমে। এই প্রসঙ্গে বলি তারাপদ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 242 - 248
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রায় একটি বইয়ের নাম দিয়েছিলেন - 'নীল দিগন্তে তখন ম্যাজিক', তাঁর এই শব্দবন্ধকেই মুচড়ে সবশেষে বলতে ইচ্ছে করে স্মৃতির দিগন্তে তাঁর ম্যাজিক আজও ছড়িয়ে রয়েছে।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, অনুপম, 'তারাপদ রায় সম্মন্ধে দুটো - একটা কথা', তারাপদ রায় রচনাসমগ্র (৫ম খণ্ড), লালমাটি, ২০২৩, পৃ. ২
২. বসু, সম্বিত, 'সাবাস ওস্তাদ', 'রোববার প্রতিদিন', ২৭শে নভেম্বর, পৃ. ১৭
৩. রায়, তারাপদ, 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে', তারাপদ রায় রচনাসমগ্র (১ম খণ্ড), লালমাটি, ২০১৩, পৃ. ৩৩০
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩০
৫. রায়, তারাপদ, 'আজীবন, সমস্ত জীবন', 'দিন আনি, দিন খাই', তারাপদ রায় রচনাসমগ্র (৫ম খণ্ড), লালমাটি, ২০২৩, পৃ. ৮৮৭
৬. মিত্র, ঋতব্রত ও দেবাশিষ চক্রবর্তী, 'সাক্ষাৎকার : তারাপদ রায় (২)', পরবার, সংখ্যা ২০, নভেম্বর ২০০০, URL - https://parabaas.com/SHORTOT4/LEKHA20/mTarapasa20.html
৭. পূর্বোক্ত
৮. রায়, তারাপদ, 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে', তারাপদ রায় রচনাসমগ্র (১ম খণ্ড), লালমাটি, ২০১৩, পৃ. ২৮৬
৯. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব (ভূমিকা), পূর্বোক্ত, পৃ. ১
১০. রায়, তারাপদ, 'কোথায় যাচ্ছেন তারাপদবাবু?', তারাপদ রায় রচনাসমগ্র (৩য় খণ্ড), লালমাটি, ২০১৮, পৃ. ৩৫৭
১১. বসু, সম্বিত, তদেব, পৃ. ১৭

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

তারাপদ রায়, "চারাবাড়ি পোড়াবাড়ি", নিমাই গরাই (সম্পা.), 'তারাপদ রায় রচনাসমগ্র' (১ম খণ্ড), কলকাতা, লালমাটি, আগস্ট ২০১৩
তারাপদ রায়, "বাংলাদেশের হৃদয় হতে", নিমাই গরাই (সম্পা.), 'তারাপদ রায় রচনাসমগ্র' (১ম খণ্ড), কলকাতা, লালমাটি, আগস্ট ২০১৩
তারাপদ রায়, "কোথায় যাচ্ছেন তারাপদবাবু", নিমাই গরাই (সাম্পা.), 'তারাপদ রায় রচনাসমগ্র' (৩য় খণ্ড), কলকাতা, লালমাটি, বইমেলা ২০১৮
তারাপদ রায়, "ধলেশ্বরী নদী তীরে", নিমাই গরাই (সম্পা.), 'তারাপদ রায় রচনাসমগ্র' (৪র্থ খণ্ড), কলকাতা, লালমাটি, ২০২২

সহায়ক গ্রন্থ :

তপন গোস্বামী, "পাঠকের চোখে তারাপদ রায়ের কবিতা", দ্রঃ সুবল সামন্ত (সম্পা), বাংলা কবিতাঃ সৃষ্টি ও স্রষ্টা, কলকাতা, এবং মুশায়েরা, জানুয়ারি ২০০৬
সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃত্তিবাসঃ বাংলা কবিতার পালাবদল, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০১৪

সহায়ক পত্র-পত্রিকা :

অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), "কেমন আছেন তারাপদবাবু?", 'রোববার প্রতিদিন', ২৭শে নভেম্বর, ২০২২